সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৬ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২৬ ॥ অক্টোবর ২০১৮

https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.6

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি : জসীম উদ্‌দীন ও প্রতিরোধী প্রবর্তনা

মোঃ মনিরুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ :

জসীম উদ্‌দীন বাংলার মাটি ও মানুষের কবি। তাঁর কবি পরিচয়ের আড়ালে লুক্কায়িত রয়েছে আরেকটি পরিচয়। তিনি একজন শক্তিশালী গদ্যশিল্পীও বটে। তাঁর রচিত স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি ও প্রবন্ধসমূহে সরস গদ্যের নিদর্শন মেলে। এই সকল রচনায় জসীম উদ্‌দীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বাংলার সাংস্কৃতিক সংকট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি একযোগে পর্যালোচনা করেছেন : বাঙালি সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে। বর্তমান উপনিবেশোত্তর পর্বে, নব্য উপনিবেশবাদ মোকাবিলার এই যুগে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধী প্রবর্তনার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রবন্ধে জসীম উদ্‌দীনের স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধসমূহের আলোকে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিপরীতে তাঁর যে প্রতিরোধের 'প্রতিষ্ঠাভূমি' গড়ে ওঠে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জসীম উদ্‌দীনের তৎপরতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের তাত্ত্বিকদের ভাবনা ও তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন অভিধার প্রয়োগ সমন্বিত করা হয়েছে।

মূলপ্রবন্ধ :

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনের উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে। বদলে যায় ভূমিতে মালিকানার ব্যবস্থা। পরিবর্তিত হয় শিক্ষা, আইন ও বিচারের পদ্ধতি। আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এই প্রভাব ক্রমশ পরিলক্ষিত হয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন আদর্শবোধ। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি, রাজনৈতিক আধিপত্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবেও, ব্রিটিশদের অনুগামী হয়ে পড়ে। শুরুতে ইংরেজানুগত বাঙালি সম্প্রদায়টি ছিল মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি। পরে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিও পাল্লা দিয়ে বিকাশ লাভ করে, এমনকি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনেও সমর্থ হয়। এই হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজানুগত্য ছিল প্রবল।

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

অবশ্য ইংরেজদের নির্মম শোষণের বিপরীতে, দ্বান্দ্বিকভাবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিবাদী ধারাগুলোও বিকশিত হয়েছে। ফলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের চাপে ও রাজনৈতিকভাবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বদলের কারণে বাংলা অঞ্চল থেকে এক পর্যায়ে ব্রিটিশদের প্রস্থান করতে হয়। কিন্তু ব্রিটিশ যুগাবসানের পরেও বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোতে ও সাংস্কৃতিক ভাবধারায় পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জসীম উদ্‌দীন তাঁর স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধসমূহে বাংলা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক তৎপরতায় এই ইউরোপীয় প্রভাব ও তার নেতিবাচক ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নির্দেশ করেছেন : ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যস্থতায় বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতার সূত্রে বাঙালি জীবনে সৃষ্ট সংকটগুলোও তিনি চিহ্নিত করেছেন। ফলে তাঁর পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে বাংলা কবিতা, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গসমূহ। ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জসীম উদ্‌দীনের এই পর্যালোচনাসমূহ ও তাঁর অবলম্বিত কাব্য-প্রকৌশল একটি প্রতিরোধী প্রবর্তনা হাজির করে। বর্তমান উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এই প্রতিরোধী প্রবর্তনা হয়ে উঠতে পারে সকল প্রকার সাংস্কৃতিক আধিপত্য মোকাবিলার প্রেরণা ও যৌক্তিক বুনিয়াদ। বাংলা অঞ্চলের উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তার নিজস্ব তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ার প্রয়োজনেও জসীম উদ্‌দীনের ‘উপনিবেশ মোকাবিলার যুক্তি ও কৌশল’ বিশ্লেষণ করা জরুরি।

মুসলমান শাসনামলে বাংলা অঞ্চলে যে প্রকারের প্রতিরক্ষা, আইন ও বিচারব্যবস্থা জারি ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে তা ক্রমশ পরিবর্তিত হয় এবং অবশ্যম্ভাবী উপায়ে জনজীবনে তা প্রভাব ফেলে। মুসলমান জমিদারশ্রেণি ও অভিজাতসম্প্রদায়ের পতন ঘটে। ফলে তাদের আশ্রিত পরিবারগুলোরও আর্থিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা ঘটে হিন্দু জমিদার ও ধনিক শ্রেণির। পরিবর্তন আসে শিক্ষা ব্যবস্থায়। সরকারি অফিস ও আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষার প্রচলন হওয়ায় মুসলমানরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ, এর জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এভাবে শুধু ভাষাগত পরিবর্তন নয়, বদল ঘটতে থাকে ভাবাদর্শগত জায়গাতেও। বিশেষভাবে বদলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানস, যারা উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। তারা ঔপনিবেশিক শিক্ষা গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরির দ্বারা জীবিকা উপার্জন করত। বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশিক পুঁজির সংশ্রয়েই এই শ্রেণির জন্ম। শুরুতে এই শ্রেণির সদস্যদের অধিকাংশই ছিল হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত যেহেতু আর্থনীতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরে বিজাতীয় ব্রিটিশদের সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ

করেছিল। পরে হিন্দুসম্প্রদায়ের অনেকটা পাল্লা দিয়েই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ততদিনে অবশ্য হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি জ্ঞানে-গরিমায় বেশ পরিণত হয়ে উঠেছে। হিন্দুমধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল ব্রিটিশদের পরীক্ষিত মিত্র। তাই বাংলার মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে সফল হওয়া কষ্টকর ছিল। একই সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা করতে হয়েছে ব্রিটিশদের কূটচাল ও বর্ণবাদী হিন্দুদের আধিপত্য। ঔপনিবেশিক আমলের প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানকে কোনো-না-কোনোভাবে করতে হয়েছে এই প্রকার মোকাবিলার কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তোষামোদ ও আত্মসমর্পণের নীতি। এটা করতে হয়েছিল কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক ঘাটতির কারণে, আবার কখনো বা বৈষয়িক স্বার্থে। এঁরাই আবার ব্রিটিশ কূটচালের কাছে জ্ঞানাভাববশত নতিস্বীকার করে, ঔপনিবেশিক পুঁজিবিরোধী সংগ্রামের বদলে, অবতীর্ণ হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে। নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তিই কেবল যথার্থ কায়দায় সমাধান অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। তবু তা তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকভাবে সংহত ও সুবিন্যস্ত ছিল না। অবশ্য সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাভূমিতেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য যৎকিঞ্চিৎ স্থাপিত হতে পেরেছিল—যদিও তা ছিল নানামুখী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও স্ববিরোধপূর্ণ। বাংলাঅঞ্চলের রাজনৈতিক পরম্পরা উত্তরোত্তর জনকল্যাণমুখী হতে পারেনি। কেননা এখনো তা নানা অমীমাংসিত বিষয়ে পরিপূর্ণ ও জটিল।

১

বাংলাঅঞ্চলের মুসলমানরা শুরুতে কোম্পানি শাসন ও ব্রিটিশ রাজত্ব মেনে নিতে পারেনি। আর ব্রিটিশরাও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি মুসলমানদের। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের ২৮ তারিখে লিখিত এক পত্রে ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানান :

> ইহা আপনি ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন যে, আমাদের নিকট হইতে সহৃদয় ব্যবহার পাইলেও মুসলমানগণ কখনও আমাদের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিবে না। তাহাদের নিজেদের বিপদের আশঙ্কাই কেবল তাহাদিগকে চুক্তি বজায় রাখিতে বাধ্য করিতে পারে। (রহিম, ২০১৭ : ৫৫)

কোম্পানির শাসকেরা শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের আস্থাঅর্জনের নীতি গ্রহণ করেন। নানাভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। অসন্তুষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে তাদের ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেক্ট কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে জন ম্যালকল্‌ম জানান : 'আমাদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের অনুরক্তি আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান উৎস।' (রহিম, ২০১৭ : ৫৫) কোম্পানি আমলের ধূর্ত শাসকেরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল : যতদিন হিন্দুসম্প্রদায় তাদের পক্ষে আছে, ততদিন মুসলমানরা, হাজারো অসন্তুষ্ট হলেও, তাদের কিছুই করতে পারবে না। ১৮৪৩

খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবারা ডিউক অব ওয়েলিংটনকে লেখেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলমান জাতি আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। হিন্দুদের আস্থা অর্জন করা আমাদের শাসননীতির লক্ষ্য।' (রহিম, ২০১৭ : ৫৬)

একদিকে ব্রিটিশরা হিন্দুজমিদার শ্রেণির বিকাশের পথ তৈরি করে দেয়। আরেকদিকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থেকে ধীরে ধীরে মুসলমানদের অপসারণ করতে থাকে। ক্রমেই মুসলমান জমিদারদের জায়গায় প্রতিষ্ঠাপিত হয় উঠতি হিন্দুজমিদারগণ। এমনকি এই সকল জমিদারদের কেউ কেউ ছিল নতুন ব্যবসায়ী ও বেনিয়া শ্রেণির, কেউ বা কোম্পানির কর্মকর্তাদের ধূর্ত অনুচর। কোম্পানির নিরাপত্তার স্বার্থেই সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলো হারায় মুসলমানরা। যদিও বাংলাঅঞ্চলের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশদের অনভিজ্ঞতার দরুণ শুরুতে তারা মুসলিম আইনই জারি রাখে। তারা মুসলমান কাজী, মুফতি, মৌলবী ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ দেয়। কিন্তু পরে তারা দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করে। ফলে এক্ষেত্রেও মুসলমানরা ক্রমশ তাদের পদগুলো হারাতে থাকে। এভাবে এক সময়ে রাষ্ট্রের যেসব উচ্চপদসমূহ মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল, সেগুলোতে ফার্সি জানা লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসবের নেপথ্যে ছিল মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের অবিশ্বাসের নীতি এবং ফার্সির বদলে সরকারি ভাষা ইংরেজি চালু করার সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বিজ্ঞাপন দিয়ে হিন্দু প্রার্থী অনুসন্ধান করা হত। (রহিম, ২০১৭)

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে *দূরবীণ* নামের এক ফার্সি সংবাদপত্রে উপর্যুক্ত বিষয়ের সমালোচনা হাজির করা হয়। সেখানে প্রকাশিত হয় :

> ছোটবড় সকল রকমের সরকারী পদ মুসলমানদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে বিশেষত হিন্দুদিগকে দেওয়া হইতেছে... সুন্দরবনের কমিশনার তাহার অফিসে লোক নিয়োগের জন্য কেবল হিন্দু প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করিয়াছে। (রহিম, ২০১৭ : ৫৮)

এছাড়াও ইংরেজিভাষা শিক্ষা করার ক্ষেত্রে অনীহার কারণে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা ভয়াবহ মাত্রায় পিছিয়ে পড়ে। এভাবে কোম্পানি শাসনামলে ও ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থনীতিক অসমতা গড়ে ওঠে। পরে হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি যতই বিকশিত হতে থাকে—অর্থনীতির এই অসম-উর্বর জমিনে—ততই সবলভাবে গজিয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রুগ্ন বীজ।

২

জসীম উদ্‌দীনের পিতা মৌলভী আনসার উদ্‌দীন মোল্লা (মৃত্যুঃ ১৯৪৭) যখন স্কুলপড়ুয়া বালক, গ্রামে-গঞ্জে ওহাবী আন্দোলনের জের তখনো থামেনি। ইংরেজ তাড়াতে না

পেরে এই আন্দোলন তখন সংস্কারবাদী রূপ নেয়। আনসার উদ্‌দীনের তাই ইংরেজি শেখা হয়ে ওঠে না। জসীম উদ্‌দীন বর্ণনা করেন—

> হাজী শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দুদুমিয়া সাহেব সুবে বাংলার খলিফা হইলেন। মাওলানা কেরামত আলীর দল তখন ইংরেজদের সঙ্গে রফা করিয়া তাঁর শাকরেদদিগকে ইংরেজি পড়ার অনুমতি দিয়াছেন। দুদুমিয়া কিন্তু টলিলেন না। তাঁর আদেশে একদিনে দশ-বারোটি নীলকুঠি জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল।
>
> তিনি খবর পাইলেন, বাজান স্কুলে নাছেরা ইংরেজের ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। এর চাইতে বড় অপরাধ তাঁর জামাতের লোকদের মধ্যে আর কিছুই ছিল না। সুতরাং বাজানকে ইংরেজি পড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে যাইয়া ভর্তি হইলেন। (জসীম, ২০১৭ : ৫-৬)

ইংরেজি না শেখার আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি জসীম উদ্‌দীনের দৃষ্টি এড়ায়নি। পরিণত বয়সে জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি খেদ জানিয়েছেন ঠিকই—'বাজান যদি ইংরেজি স্কুলে পড়িতেন তবে ডেপুটি হইতে পারিতেন, উকিল হইতে পারিতেন। আমাদের ছোট সংসারে কোনো প্রকারের অর্থকষ্ট থাকিত না।' (জসীম, ২০১৭ : ৬) তাঁর পিতা মাসে মাত্র পাঁচ টাকা বেতনে ফরিদপুর হিতৈষী এম. ই. স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই টাকায় সংসার চলত না। তাই এক প্রকার আর্থিক দুর্দশার ভেতর দিয়েই জসীম উদ্‌দীন বেড়ে ওঠেন। অবশ্য আনসার উদ্‌দীনের শিক্ষকতা পেশা নির্বাচনের নেপথ্যে এক ধরনের আদর্শবাদ ছিল। ওহাবী ভাবমণ্ডলে বেড়ে উঠলেও তাঁর চিন্তায় উগ্র ধর্মান্ধতা ছিল না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজমোহন পণ্ডিতের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি চলে আসেন শিক্ষকতা পেশায়। এমনও সময় গিয়েছে—স্কুল থেকে বেতন না পেয়ে অন্যান্য শিক্ষকেরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষকতা তো মৌলভী আনসার উদ্‌দীনের চাকরি নয়—ছিল সাধনা। (জসীম : ২০১৭) শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। পিতার সম্পর্কে জসীম উদ্‌দীন লেখেন :

> একবার আমাদের বাড়িতে কবি নজরুল ইসলাম আসিয়া কিছুদিন থাকিলেন। গভর্নমেন্টের চাকুরিয়া আমার এক ভগ্নীপতি খবর পাঠাইলেন, নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক দলের লোক। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলে শ্বশুরবাড়ি আসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ইহাতে আমার পিতা বড়ই খাপ্পা হইয়া আমার সেই ভগ্নীপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন তিনি যদি আমার বাড়িতে না আসেন, না আসিতে পারেন। কিন্তু বাঙালির এই প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার কাছে বহু সম্মানের পাত্র, জামাতার অসুবিধার জন্য তাঁকে তিনি নিজের বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিবেন না। (জসীম, ২০১৭ : ১৩)

গ্রাম্য বিচার-সালিশেও মৌলভী আনসার উদ্‌দীন নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে সত্যের পক্ষ নিতেন। পিতার আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই জসীম উদ্‌দীনের ব্যক্তিত্ব গঠনে অনুপ্রেরণার কারণ হয়েছে।

৩

গ্রামে গঞ্জে ইসলামি শিক্ষার প্রধান বাহন ছিল বিভিন্ন মিলাদমাহফিল। মৌলবি সাহেবেরা কোরান কেতাব ঘেঁটে লাইলি মজনু, ইউসুফ জুলেখা, মহরম, ইসমাইলের কোররবানির কেচ্ছা প্রভৃতি কাহিনি বর্ণনা করে আদর্শবাদ শিক্ষা দিতেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে ইসলামি ঐতিহ্যে মোড়ানো নিজস্ব সংস্কৃতিকে নাকচ করেননি জসীম উদ্‌দীন। কেননা, তিনি সেই সংস্কৃতির শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার বাস্তবায়ন। গ্রামের মানুষের আদর্শবাদ তাঁকে সম্মোহিত করেছিল। বাংলাদেশের জনমানুষের মননে সেই জ্ঞানকাণ্ডের উর্বর রূপায়ণ তিনি দেখেছেন এবং পরে দেখেছেন তার বিকৃতিও। তিনি দেখেছেন : বুর্জোয়াদের হাতে এই ইসলামি সংস্কৃতি কীভাবে সুবিধাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রবাহিত হয়েছে কয়েকটি ধারায়। তাই একজন বাঙালি মুসলমানের পক্ষে ইসলামকে পর্যালোচনা করা কোনো সময়েই সহজ কাজ ছিল না। এছাড়া কোনো ভাবাদর্শকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করাটা একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি বাংলাদেশের বর্তমান প্রগতিশীল রাজনীতিতেও আবহমান ইসলামি সংস্কৃতির পর্যালোচনার কাজ শেষ হয়ে যায়নি। ইসলাম-বিতর্কে জসীম উদ্‌দীন বরং বাহাস করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও। তিনি অসংকোচে স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনে মনসুর মৌলবির প্রভাবের কথা। তিনি *জীবনকথা* -গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> আমার প্রথম জীবনে এই মৌলবি সাহেবের যে প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার জন্য আজও আমি আর দশজনের মত আমাদের আলেমসমাজকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। পূর্বকালে এঁরা আমাদের সমাজে যে আদর্শবাদের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক কোনো ভণ্ড মৌলানাকে আমি সমর্থন করি না। কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমার 'মুন্সী সাহেব' কবিতাটি যখন *সওগাতে* ছাপা হয়, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ গিয়া, তোমার কবিতাটি কাঠমোল্লারা মসজিদের দেয়ালে দেয়ালে লটকাইয়া রাখিয়াছে।" এই উপহাসে আমি এতটুকুও লজ্জিত হই নাই। নজরুলের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা থাকিলেও আমরা দুইজনে দুই জগতের লোক। নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী—ভাঙার প্রতীক। তিনি বলিতেন, "আমি আগে আগে ভাঙিয়া যাইব। তারপর সেখানে নব-নবীনেরা আসিয়া নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মাতিবে।" আমি বলিতাম, "আমাদের যা আছে তারই উপর নতুন সৃষ্টি করিতে হইবে। পুরাতনের ভিতরে যা কিছু মণি-মাণিক্য আছে তাহাকে ঘষিয়া-মাজিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিতে হইবে। (জসীম, ২০১৭ : ৩২-৩৩)

জসীম উদ্‌দীন বাংলাদেশের মানুষের মননে উপর্যুক্ত আদর্শবাদ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হয়তো তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন এর রাজনৈতিক সম্ভাবনাও। তাঁর কথাতেই সমাজের 'আর দশজন' তখন এই পরম্পরাকে 'সমালোচকের দৃষ্টিতে' দেখতেন। হয়তো এই 'সমালোচকের দৃষ্টি' সাধারণ দৃষ্টি ছিল না—ছিল বিদ্বেষ ও পরিহারের দৃষ্টি—কেননা, পরের বাক্যগুলোতেই তো জসীম উদ্‌দীন স্বয়ং সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাহলে প্রথমে কেন বললেন যে, সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন না। হয়তো নিজের সমালোচনাকে তিনি 'পর্যালোচনা' জ্ঞান করেছেন। এবং তাঁর বোঝাপড়ায় 'পর্যালোচনা' আর 'সমালোচনা' এক জিনিস ছিল না। ইসলাম নিয়ে উগ্র রাজনীতি নেই—তিনি কিন্তু তা দাবি করছেন না। বরং পর্যালোচনা দ্বারা তিনি স্পষ্ট আলাদা করেছেন 'আধুনিক কোনো ভণ্ড মৌলানাকে'। অর্থাৎ যে চিন্তার দার্শনিক বিকাশ থেমে গেছে—তা ইসলামি হোক আর যাই হোক—তিনি তা সনাক্ত করেছেন এবং তার শব বহন করতে ছিলেন গররাজি। বরং তার নিপীড়ন প্রতিহত করতে সদাপ্রস্তুত ছিলেন। *স্মৃতির পট* গ্রন্থে এর সাক্ষ্য মিলবে :

> ওহাবি আন্দোলনে যখন দেশে মওলানারা এদেশ হইতে ইংরেজ তাড়ানো অসম্ভব জানিলেন, তখন তাঁহারা দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গুণী ব্যক্তিদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার ফলে আজ আমাদের সমাজে বড় সাহিত্যিক নাই; বড় চিত্রশিল্পী নাই—বড় সুরশিল্পী নাই। আজও এই অত্যাচার যে শেষ হয় নাই হাজেরা বিবি আর তার স্বামী ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। আমাদের মুসলিম সমাজে এই অনাচার আর কতদিন চলিবে? (জসীম, ২০১৩খ : ১২৮)

তিনি জোর দিয়েছেন পুরনোকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার উপর—অর্থাৎ 'পুরাতনের ভিতরে যা কিছু মণিমাণিক্য আছে' তাকে পর্যালোচনার দ্বারা আরো নিজের করে পেতে হবে। এবং তা দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির দাপট। বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনীতির গতিপথ নির্মাণে এই ছিল জসীম উদ্‌দীনের শিক্ষা। এই প্রগতিশীল ভূমিকা অনেক সাহিত্যিকই গ্রহণ করতে পারেননি। হয়তো তারা কেউ ধর্মান্ধতার পক্ষাবলম্বন করেছেন, নয়তো গ্রহণ করেছেন ইসলামি ভাবধারাকে প্রতিহত করার রাজনীতি। এই মোকাবিলা জসীম উদ্‌দীন করতে পেরেছেন, কারণ বাংলার নিজস্ব ভাবপরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মরমি ভাবধারা থেকে সরাসরি রস গ্রহণ করে তাঁর সত্তা নির্মিত হয়েছে। সেই ভাবধারায় কে হিন্দু কে যবন তা বিচারের নিক্তি নেই। সকলে সেখানে শামিল হয় মর্যাদার একই কাতারে। এই জমিনে দাঁড়িয়েই ভেদ মোকাবিলা করেছেন জসীম উদ্‌দীন।

ব্রিটিশদের ভেদনীতির ফলে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব বাংলাঅঞ্চলের রাজনীতির ক্ষেত্রে মূল নিয়ামক হয়েছে। হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক প্রকার প্রতিযোগিতা করেই বিকশিত হয়েছে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাই মুসলমানিত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে

বর্ণবাদী হিন্দুদের নিষ্কলুষভাবে মোকাবিলা করাটা সহজ-কাজ ছিল না। বিশেষত বর্ণবাদী হিন্দুদের ছুঁৎমার্গের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের অন্তরের দরজা বন্ধই ছিল। এখানেও জসীম উদ্‌দীন ব্যতিক্রম। মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতি তিনিও করেছেন, কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায়ের অবদানকে কখনো খাটো করে দেখেননি। যা কিছু উত্তম, তা তিনি গ্রহণ করেছেন—যা অগ্রহণযোগ্য, তা সমর্থন করেননি। তিনি তাঁর *জীবন কথা*তে উল্লেখ করেন :

> হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার লইয়া ব্রাহ্মরা তীব্র সমালোচনা করিতেন। তাহাদের ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদ, ধর্মান্ধতা, পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহারা যুক্তির তীব্র কষাঘাত করিতেন। আমার খুব ভালো লাগিত। ইতিপূর্বে হিন্দু-সমাজের সঙ্গে মিশিতে যাইয়া তাহাদের ধর্মান্ধতা ও ছুঁৎমার্গের জন্য বহুবার মনে আঘাত পাইয়াছি, তাহাদের সমালোচনা আমার সেই ক্ষতস্থানে পেলব স্পর্শ মাখাইয়া দিত। (জসীম, ২০১৭ : ১৮৮)

জসীম উদ্‌দীনের মোকাবিলার শক্তি নিহিত ছিল তাঁর বৈচিত্র্যময় বেড়ে ওঠায়। জীবনে বহু হিন্দুপরিবারের সাহচর্য পেয়েছেন তিনি। মানুষ হয়েছেন তাঁদের স্নেহের পরশে। কারো পিতৃস্নেহ, কারো মাতৃস্নেহ পেয়েছেন। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে তাই 'মুসলমানিত্ব'-এর বিপরীতে 'হিন্দুত্ব'-এর বাইনারি (Binary) সম্পর্ক তিনি মেনে নিতে পারেননি। কারণ, তাঁর বাস্তবতায় তো ধরা দেয়নি কোনো অখণ্ড মুসলমানিত্ব, বা তার বিপরীতে কোনো অখণ্ড হিন্দুত্ব। জ্ঞানজগতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সাম্প্রদায়িক নির্মিতি তাই জসীম উদ্‌দীনের আস্থা অর্জন করেনি। বর্ণবাদকে ঠিকই সমালোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছেন সম্প্রীতিটুকুও। বরং পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ফলে কাছ থেকে জেনেছেন হিন্দুদের ঘৃণা ও ভালোবাসার ভাষা। (জসীম, ২০১৭) এই ভালোবাসাই তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে হিন্দুসমাজের নিষ্কলুষ মোকাবিলায়। মনসুর মৌলবির মত বালক বয়সে এক সন্ন্যাসী ঠাকুরেরও প্রভাব পড়ে জসীম উদ্‌দীনের উপর। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান :

> এইভাবে ঘনঘন সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিয়া হিন্দু-দেবতার পৌরাণিক কাহিনীগুলি আমি জানিয়া ফেলিলাম। আমার প্রথম জীবনে মুনসুর মৌলবি সাহেবের কাছে যে ইসলামিক শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহা ভুলিয়া গেলাম। কালী, মহাদেব, দুর্গা, শিব, প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতে লাগিলাম। (জসীম, ২০১৭ : ১৪৯)

তারপর ব্রাহ্মদের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। অধ্যাপক এন. সি. সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরিচয় হয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে। পড়ে ফেলেন কেশব সেনের জীবনী, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, অজিতকুমার চক্রবর্তীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, জগদীশবাবুর গৌরাঙ্গলীলামৃত, গিরিশ বসুর তাপসমালা ইত্যাদি গ্রন্থ। (জসীম, ২০১৭) স্মৃতিকথায় তিনি উল্লেখ করেন :

> আমার মন হইতে ধীরে ধীরে হিন্দু দেবদেবী অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মিঃ সেন আমাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানে বসিয়া তিনি প্রার্থনা করিতেন। আমি তাঁর প্রার্থনায় যোগ দিতাম। (জসীম, ২০১৭ : ১৩)

জসীম উদ্‌দীন সান্নিধ্যে এসেছেন দীনেশচন্দ্র সেনের, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকের। দীনেশচন্দ্র সেন যেমন দিয়েছিলেন পিতৃস্নেহ, তেমনি সাম্প্রদায়িক রোষের মুখোমুখি করেছিলেন শিক্ষক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (জসীম, ২০১৫) *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থেও তিনি হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের স্পষ্ট প্রতিবাদ জানান। (জসীম, ২০১৮)'তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মত' (জসীম, ২০১৮ : ২৭) হিন্দুসাম্প্রদায়িকতাকে তিনি মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেই আবার আক্রান্ত হননি সাম্প্রদায়িকতায়। এখানেই জসীম উদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠত্ব। কমবেশি সকলকেই তিনি গ্রহণ করেছেন—কেবল গ্রহণ করেননি সাম্প্রদায়িকতার কোনো সংকীর্ণ পাঠ। আর বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলা করা, এক অর্থে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকেই মোকাবিলা করা।

৪

পূর্ব বাংলার মুসলমান জসীম উদ্‌দীন বেড়ে ওঠেছেন স্বদেশি আন্দোলনের রমরমা যুগে। রাজধানী শহর কলকাতা অতিক্রম করে আন্দোলনের ঢেউ যখন পৌঁছে যাচ্ছিল ফরিদপুরের মত মফস্বল শহরগুলোতেও, দেশ জুড়ে তখন স্বদেশিদের অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৩) চলে—নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী জসীম উদ্‌দীন—অনেক সহপাঠীর সঙ্গে স্বদেশি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুকালের জন্য ত্যাগ করেন ইংরেজ আমলের বিদ্যালয়। চলে আসেন কলকাতায়। পড়তে গেলেন জাতীয় বিদ্যালয়ে। কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের এখানে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। ইংরেজ-আমলের বিদ্যালয়গুলোকে নেতারা বলতেন গোলামখানা। নেতাদের কথায় সেই গোলামখানা ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে গিয়েও তিনি দেখলেন জারি আছে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা। মোহভঙ্গ ঘটে তাঁর। বলেন:

> নেতাদের কথায় গোলামখানা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি;... আমহার্স্ট স্ট্রীটে একদিন জাতীয় বিদ্যালয় দেখিয়া আসিলাম। ক্লাসে গিয়াও যোগ দিলাম। ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সবই ইংরেজিতে পড়ানো হয়। মাস্টার একজনও বাংলায় কথা বলেন না। কারণ ক্লাসে হিন্দিভাষী ও উর্দুভাষী ছাত্র আছে। বাংলায় পড়াইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু নবম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলে কতটাই বা তাহারা বুঝিতে পারিবে;... সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের মোহ আমার মন হইতে মুছিয়া গেল। নেতাদের মুখে গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়াছি। ইংরেজ-আমলের বিদ্যালয়গুলি গোলামখানা; উহা ছাড়িয়া বাইরে আইস। এখানে বসন্তের মধুর হাওয়া বহিতেছে। আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখ, বিদ্যার সূর্য সাত ঘোড়া হাঁকাইয়া কিরূপ বেগে চলিতেছে। কিন্তু গোলামখানা ছাড়িয়া আমি কতদিন আসিয়াছি, বসন্তের হাওয়া

> তো বহিতে দেখিলাম না। জাতীয় বিদ্যালয়ের সেই সাত ঘোড়ার গতিও অনুভব করিতে পারিলাম না। (জসীম, ২০০৬ : ১২)

ফলে জসীম উদ্‌দীন ফরিদপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই অল্প বয়সেই কি তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণির স্ববিরোধ? বালক জসীম উদ্‌দীন কি বুঝতে পেরেছিলেন এই জাতীয়তাবাদ স্ববিরোধে ঠাসা? যদি বুঝতে পারেন, তাহলে এটিই ছিল তাঁর প্রথম পর্যালোচনা। অর্থাৎ বাঙালি বুর্জোয়ারা তাদের চিন্তাকে ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টি সাধনে সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। সেই কালে সাহিত্যসাধনা ছিল দেশসাধনারই নামান্তর। তা ছিল এক প্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠারই রাজনীতি। দেরি করে হলেও মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান শ্রেণি এটা বুঝতে পারে। তাই তাঁরা বাংলা সাহিত্যে নিজেদের অন্বেষণ করতে থাকে ও অবদান রাখতে উদ্যোগী হয়। গড়ে তোলে মুসলমানদের সাহিত্য। হাত দেয় সাহিত্যের ইতিহাসপুনর্গঠনে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিল সাহিত্যের মাধ্যমেই হীনবল মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। বাঙালি মুসলমানদের নেতা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাই জসীম উদ্‌দীনের হাত ধরে বলেছিলেন :

> জসীম! তুমি তো কবি! কবিরা নাকি দেশের দূর-ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। বলতে পার আমার এই আজন্ম সাধনা কি একদিন সফল হবে? আমি তো নিজের জন্যে সম্মান চাইনে, অর্থ-সম্পদ চাইনে। আমি চাই এই ঘুমন্ত জাত আবার মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠুক—সিংহ গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে উঠুক। আমি চাই এমন একটি মুসলিম-সমাজ, যারা বিদ্যায়, সাহিত্যে, সাহসে, আত্মত্যাগে কারও পিছপা হবে না। যা কিছু মিথ্যা যা কিছু অন্ধ কুসংস্কার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। দেশের মেয়েদের পরদায় আবদ্ধ রেখে তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার আলোবাতাস বন্ধ করে রাখবে না—স্বাধীন সজীব একটি মুসলিম জাতি। (জসীম, ২০০৬ : ৭৩)

আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহিত্যচর্চায় জসীম উদ্‌দীন ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। সাহিত্য তাঁর কাছে নিছক বুর্জোয়া ভাব সরবরাহ করেনি। তাঁকে দিয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক শর্ত। নানা শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল জসীম উদ্‌দীনের। অভিজ্ঞতায় ছিলেন টইটম্বুর। সিরাজী সাহেবের আবেদন উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। কারণ, হাত ধরে যে আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেছেন জসীম উদ্‌দীন তো সেই একই পথের পথিক। বরং আরও মাটিঘেঁষা। আর এই জসীম উদ্‌দীন তো কেবল কবিই হতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মত কবি। আর এই সাহিত্যই তাঁকে রাজনৈতিক মোকাবিলায় ক্রমশ আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। সাহিত্য তাঁকে সাহস জোগায়। সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠন করতে গিয়ে খোদ সমাজ-ব্যবস্থাটাকেই যেন তিনি পুনর্গঠনের কাজে লেগে যান। বলেন, 'বাঙলা-সাহিত্য একদিন বিরাট সংস্কৃত-সাহিত্যের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, জনসাধারণের রস-পিপাসার তাগিদই কিন্তু সেদিন জয়যুক্ত

হয়েছিল'। (জসীম, ২০১৪ : ৩২) এবার স্পষ্ট হয় তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি পর্যালোচনার গতিপথ পরিবর্তন করছেন। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে চলে এসেছে জনসাধারণ। কারণ, জসীম উদ্‌দীনের বুঝতে দেরি হয়নি যে বুর্জোয়া শ্রেণির সাহিত্য আসলে দেশের জনগণের সাহিত্য নয়। ভেদ আছে এদের মধ্যে। তাই তিনি নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে থাকেন ইতিহাস। উল্লেখ করেন :

> ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত বাঙলা-সাহিত্য বলতে আমরা জনসাধারণের সাহিত্য বুঝতাম। অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্য থেকে কোনো কোনো কবি মণিমাণিক্য আহরণ করেছিলেন, কিন্তু মোটামুটি বাঙলা-সাহিত্য ছিল জনসাধারণের সাহিত্য। বাঙলার 'মনসামঙ্গল', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' অগণিত 'বৈষ্ণব কবিতা' এগুলোকে আমি গণসাহিত্যের পর্যায়েই ফেলব।
>
> চৈতন্য আন্দোলন আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। তাঁরাও জনসাধারণের জন্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কারণ, চৈতন্যের ধর্ম ছিল জনসাধারণের জন্য। সেইজন্য চৈতন্যের ভক্তেরা জনসাধারণকে উপেক্ষা করেননি। (জসীম, ২০১৪ : ৩২)

অর্থাৎ জসীম উদ্‌দীন দাবি করেছেন, ইংরেজদের আগমন ও শাসনের ফলে বাংলাঅঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বোঝাপড়ায় একটা গোল তৈরি হয়েছে। বলেছেন, 'আজ ইংরাজের কাছে রুচিজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা আমাদের অতীত জীবনের রস-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি'। (জসীম, ২০১৩ক : ৩৮-৩৯) যে রুচিশীলতা এই বিচ্ছিন্নতা এনেছে—রুচিঅলাদের আলাদা করেছে মানুষের সাধারণ কাতার থেকে— জসীম উদ্‌দীন সেই রুচি নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ঘুচাতে চেয়েছেন ভেদ। জমিদার ও ডেপুটিদের হাতে থাকা বাংলা সাহিত্যকে তাই তিনি করে তুলতে চান গণমানুষের সামগ্রী। তাঁর প্রশ্ন : 'শিশুদের জন্য যদি শিশু-সাহিত্য গড়া যায়, তবে জনসাধারণের জন্য জন-সাহিত্য গড়া যাবে না কেন?' (জসীম, ২০১৪ : ৩১)

তারপর জসীম উদ্‌দীন বিশ্লেষণ করলেন বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক পরম্পরা। উন্মোচন করলেন উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া। নির্দেশ করলেন : ঠিক কীভাবে সমাজ-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি নেতৃত্বের স্থান দখল করল, যে নেতৃত্ব বদলে দিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির বিচারপ্রক্রিয়া, তৈরি করল ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্থানীয় ধারক ও বাহক শ্রেণি। জসীম উদ্‌দীন উল্লেখ করেন :

> ইংরেজ এদেশে এসে আমাদের মধ্যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন। কারণ তাঁদের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সমর্থন খুঁজে পেলেন। মুসলমান-মধ্যবিত্তরা ইংরেজের কাছে কোনো উৎসাহই পেল না। কারণ, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদের মন থেকে সেদিনও ভাঙেনি।... এর ফলে মুসলমানের যে কৃষ্টির কয়েকটি কেন্দ্র ফুটে উঠেছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম, আদিনা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে, ইংরেজ এসব জায়গার সমস্ত importance নষ্ট করে দিল। কলিকাতায় তাঁরা নতুন নগর পত্তন করলেন, হিন্দু-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের দল এখানে এসে আস্তানা তুলল। যে দলটি নগরে এসে বাসা বাঁধল, নগরের জৌলুস

> তাদের চোখ ঝলসে দিল। ইংরেজের নতুন সভ্যতা এরা চোখ বুজে গ্রহণ করল।... নতুন যে মধ্যবিত্ত-হিন্দু-দলটি শহরে এসে আস্তানা তুলল, তাতে শহরে তাদের নিজস্ব কোনো tradition-এর বনিয়াদ ছিল না। সেইজন্য ইংরাজের নগরে এসে তারা ইউরোপীয় ভাবধারার পানপাত্রটি পরিপূর্ণ মনে শুধু গ্রহণই করল না, নিজের দেশের গ্রাম্য-জীবনের সেই প্রাচীন ভাবধারার বনিয়াদকে লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। (জসীম, ২০১৪ : ৩৩-৩৪)

জসীম উদ্‌দীন উচ্চারণ করলেন, 'আমাদের মধ্যে'—অর্থাৎ গোড়াতেই তিনি ভেদজ্ঞান করেননি। পোষণ করেননি অযাচিত কোনো বিদ্বেষ। অর্থাৎ ইংরেজ আগমনের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ে জসীম উদ্‌দীন কোনো ভেদ স্বীকার করছেন না। ইংরেজরা এসে শাসনের সুবিধার্থে ভেদ গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন ধারার ইতিহাসে যা-ই লিপিবদ্ধ থাকুক, জসীম উদ্‌দীন বাংলার ইতিহাসের এই মীমাংসাই মেনে নিচ্ছেন। ফলে তাঁর ইংরেজ-মোকাবিলা সাম্প্রদায়িকতায় গিয়ে শেষ হয়ে যায়নি, বরং চিন্তার পরিক্রমায় ঠিকই তা লাভ করেছে ব্রিটিশবিরোধিতার শক্ত বুনিয়াদ।

বুর্জোয়া শ্রেণির সাহিত্য যে মাটিসংলগ্ন মানুষের কথা বলতে অপারগ, জসীম উদ্‌দীন সেই সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, 'মাইকেলের কাব্যধারাটি যে বাঙলাদেশে টিকল না, তার কারণ, বাঙলার মাটির সঙ্গে তাঁর কাব্যের ধারা শিকড় গাড়তে পারেনি'। (জসীম, ২০১৪ : ৩৩) তাই বাংলা সাহিত্যকে তিনি 'মধ্যবিত্ত সমাজের পকেট' (জসীম, ২০১৪ : ৩৪) থেকে বের করে জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন :

> আমাদের ঢাকার ভাষায় প্রথম গদ্য বই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ এসে এই ভাষাকে জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাষায় পরিণত করলেন। বাঙলা সাহিত্য শুধুমাত্র দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের পকেটেই আবদ্ধ রইল। দেশের জনসাধারণ আর এর অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারল না। আজ যত করেই আমরা বঙ্কিম-হেম-নবীন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের জন্য গৌরব বোধ করি না কেন, একথা ভাবতে সত্যিই বড় কষ্ট, আজ বঙ্গভাষার বংশীধ্বনিতে যমুনা উজান বয় না, শ্যামলী ধবলী গৃহে চলে না। বাঙলার নভেল উপন্যাসগুলি শুধু কলিকাতাবাসী কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোকের কথায় ভরা। দেশের জনসাধারণ তার ভেতরে নিজেদের খুঁজে পায় না। (জসীম উদ্‌দীন, ২০১৪ : ৩৪)

জসীম উদ্‌দীনের ভাষায়—ইংরেজরাই ঢাকার 'importance নষ্ট করে' দিয়েছে। মুসলিম কৃষ্টিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্যে। (জসীম, ২০১৪) গড়ে তুলেছে কলকাতা শহর। তাই কলকাতা ছিল আপাদমস্তক ইংরেজদের শহর। কেন্দ্র ছিল ইংরেজি সংস্কৃতির। পরে তা হয়ে উঠেছিল হিন্দু মধ্যবিত্তের শহর। মুসলমান মধ্যবিত্তের উপর হিন্দু মধ্যবিত্তের হেজিমনি (hegemony) সনাক্ত করা জসীম উদ্‌দীনের পক্ষে কঠিন হয়নি। তিনি নিজেই এর সাক্ষ্য দিয়েছেন :

> ছোটকাল হইতে কি করিয়া আমার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল মুসলমানেরা কেহ ভালো লিখিতে পারে না। সেইজন্য মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। (জসীম উদ্‌দীন, ২০০৬ : ১৭)

মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এই হেজিমনির জোরালো প্রভাব ছিল। তাঁরা হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুকরণ করেই কেবল নিজেদের ধন্য জ্ঞান করতেন না, এমনকি নিজেদের 'লিখিত গল্পে হিন্দু চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সেই Inferiority complex-এর ইন্ধন যোগাইতেন'। (জসীম, ২০১৪ : ৪৫) জসীম উদ্‌দীনের ভাষায় : 'অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোধা গণনা করায় তাঁহাদের [হিন্দুদের] জীবন ও সাহিত্যকে আমরা রূপকথার ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে করি।' (জসীম, ২০১৪ : ৪৪) জসীম উদ্‌দীন যে সময়ের কথা বলেছেন ঢাকার সংস্কৃতি তখনও পরিণত রূপ পরিগ্রহ করেনি। কিন্তু ঢাকা যখন শিল্প ও সাহিত্যে পাকাপোক্ত আসন গড়ে তুলল, হয়ে উঠল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী, তখনও ঢাকা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নগর কলকাতার 'হেজিমনি'-র কতটা বাইরে বের হতে পারল এই প্রশ্ন তোলার যৌক্তিকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি।

৫

যথারীতি জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকেই জসীম উদ্‌দীন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছেন। আর যতটা না ঔপনিবেশিক শাসনের, তার চেয়ে বেশি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছেন তিনি। বিরোধিতা করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির স্থানীয় 'এজেন্ট'দের (Agent)। তাঁর এই বিরোধিতা ছিল আত্মসত্তার প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই। জসীম উদ্‌দীনের আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতি মূলত বাঙালি মুসলমানেরই আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতি। যদিও এই রাজনীতি উপনিবেশিত বুর্জোয়াদের প্রভাবমুক্ত ছিল না। বরং নেতৃত্বে ছিল সেই বুর্জোয়া শ্রেণিই। তবে জসীম উদ্‌দীন খাঁটি বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পারেননি—এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ। জসীম উদ্‌দীনকে পর্যালোচনার যাবতীয় শর্ত এই বৈশিষ্ট্যের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত।

কেন তিনি খাঁটি বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পারলেন না? কারণ, মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ ছেদ ঘটেনি। তাঁর সত্তা গঠনের উপাদানে ছিল ঔপনিবেশিক চিন্তার অনুপস্থিতি। জসীম উদ্‌দীনের ভাষায়, 'ইংরেজ আগমনের পরে ইউরোপের তীব্র মদিরা পান করে আমরা ধীরে ধীরে সব খোয়ালাম।' (জসীম, ২০১৪ : ৩২) জসীম উদ্‌দীনের পানপাত্রে কিন্তু 'ইউরোপের তীব্র মদিরা'র স্থান সংকুলান হল না। কেননা, তাঁর পানপাত্র ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাঁর কবিজীবনের অভিষেক হয়েছিল কবিয়ালদের হাত ধরে। এই

কবিয়ালরাই তাঁকে দিয়েছিল কবিতার শরীর, আর সেই শরীরে আত্মার রসদ জোগাল তাঁর অন্ধ দাদা। জসীম উদ্‌দীন উল্লেখ করেন, 'আমার কবি জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল এই দাদার গল্প, গান ও কাহিনীর ভিতর দিয়া'। (জসীম, ২০১৭ : ৪৫) তাঁর কাব্য তাই কাহিনিধর্মিতা পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি কখনোই। তেমনি পরিবর্তিত হল না তাঁর কবিতার ছন্দ ও শরীরের গড়ন। তাই শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জসীম, ২০১৩) ও কাজী নজরুল ইসলামের মত (জসীম, ২০০৬) কবিতা লিখলেও তিনি তা অব্যাহত রাখেননি। কারণ, এতে তাঁর মন নিবিষ্ট হচ্ছিল না বরং কবিয়ালদের নিকট থেকে যে-আঙ্গিক তিনি আত্মস্থ করেছিলেন, সেখানে নিজের প্রতিভার যোগ ঘটিয়ে লিখতে শুরু করলেন। লিখলেন তাঁদেরই কথা, যাঁদের জীবন সেই আঙ্গিকের উপযোগী। বললেন, 'আমার কবিতা *প্রবাসী*তে পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের চাষীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতি লইয়া যখন নিজস্ব স্টাইলে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম, কোন পত্রিকাই আর আমার কবিতা ছাপে না।' (জসীম, ২০১৫ : ১০) জসীম উদ্‌দীন তাঁর কৌশল পরিবর্তন করলেন না। এটিও ছিল তাঁর একটি প্রতিবাদ। পরিণত বয়সে নাম ধরে ধরে তিনি গুরুচরণে ঋণ স্বীকার করলেন :

> আমার নিজের রচনায় তেমন চাতুর্যভরা মিল বা অনুপ্রাসের বর্ণচ্ছটা নাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আরও অনেক সমালোচক বলিয়াছেন, "আমার ছন্দের গতি খুব সহজ।" ইহা যদি আমার গুণ হইয়া থাকে তবে এই শিক্ষা আমি পাইয়াছি আমার দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কবিয়ালদের কাছে। তাহারাই আমার কাব্যজীবনের প্রথম-গুরু। সেই যাদব, পরীক্ষিৎ, ইসমাইল, হরি পাটনী, হরি আচার্য এঁদের কথা আমি যখন ভাবি আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে। (জসীম, ২০১৭ : ১৩০-১৩১)

তাঁর কবিতার এই কাঠামোতে চাইলেই কি পরিবেশন করা যেত 'ইউরোপের তীব্র মদিরা'? না, যেত না। আধেয় ও আধারে সুসমঞ্জস তা হতো না কখনোই। জসীম উদ্‌দীনও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে করতে পেয়ে গেলেন নিজস্ব ভিত্তিভূমি। 'ইউরোপের মদিরা' অল্পবিস্তর তাঁর মগজে প্রবেশ করলেও বেমালুম তাই মাতাল হলেন না। আর আপাদমস্তক বুর্জোয়া হওয়া সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। অর্থাৎ জসীম উদ্‌দীন ছিলেন এমন একজন কবি, যিনি চাইলেও তাঁর পক্ষে বুর্জোয়া কবি হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তা সম্ভব হলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠতেন না। অন্তত জসীম উদ্‌দীনের কবিসত্তা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। অবশ্য এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইউরোপীয় আধুনিকতার মানদণ্ডে তিনি 'অনাধুনিক' সাব্যস্ত হয়েছিলেন। (হুমায়ুন, ২০১৩) এই কারণে শহুরে কবিকুলের কাছে তিনি ছিলেন অবজ্ঞার পাত্র। জসীম উদ্‌দীন পাঠে তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল না। এভাবেই পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের সঙ্গে তাঁর ছেদ ঘটে যায়। (সৈয়দ, ২০১৩)

অর্থাৎ যেসকল বৈশিষ্ট্যাবলির কারণে জসীম উদ্‌দীনকে অনাধুনিক বিবেচনা করা হয়ে থাকে, মূলত তাঁর শক্তিমত্তা ছিল সেখানেই নিহিত। সাহিত্যচর্চায় তিনি সচেতনভাবেই দেশীয় আঙ্গিক ও উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশের মাটি ও মানুষ এবং তাঁদের কাব্যচর্চার পরম্পরাকে ধারণ করেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন আধুনিকতার অগ্রযাত্রায়। তাই জসীম উদ্‌দীনের নিকট আধুনিকতা ভিন্নভাবে ধরা দেয় : তা জারিত হয় দেশীয় শক্তি ও সম্ভাবনায়। আধুনিকতা সম্পর্কিত তাঁর এই বোধের পার্থক্য ইউরোপীয় আধুনিকতার বিকল্প প্রবর্তনা বহন করে। তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জসীম উদ্‌দীন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির কবলে পড়লেন না। সমালোচকদের ভাষায় যা ছিল আধুনিক বৈশিষ্ট্যের ঘাটতি। সেই ঘাটতির বলেই দেশ পুনর্গঠনে তিনি পেয়েছিলেন বিজাতীয় ইউরোপীয়-সংস্কৃতিকে বিরোধিতা করার এই সৎসাহস। এই কারণেই, তাঁর ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি মোকাবিলার ধরন ও কৌশল পর্যালোচনা করা বর্তমান উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। আর তাঁর প্রস্তাবনাসমূহের প্রায়োগিকতা বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের মধ্যেই জসীম উদ্‌দীন-চর্চার সার্থকতা নির্ভর করবে।

টীকা

১. 'মানবিক সমাজ তৈরি হয় স্বেচ্ছাসেবামূলক (অথবা স্বল্পযৌক্তিক ও জোর না করে) সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। যেমন : বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমিতি। আর রাজনীতিক সমাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র)। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এদের সরাসরি কর্তৃত্ব রয়েছে। সংস্কৃতিকে কার্যকরী দেখা যায় মানবিক সমাজে। যেখানে আইডিয়ার প্রভাব, প্রতিষ্ঠানের প্রভাব কিংবা অন্যলোকের কর্মের প্রভাব দমনমূলকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে না। বরং, গ্রামসির মতে, সংস্কৃতি সেখানে ক্রিয়াশীল থাকে সম্মতির ভিত্তিতে। একদলীয় মতবাদের সমাজ ছাড়া সব সমাজেই নির্দিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক রূপ অন্যগুলোর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সব সময়েই যেন কতকগুলো আইডিয়া থাকে অন্যগুলোর চেয়ে প্রভাবশালী। সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের এ রূপটিকে গ্রামসি চিহ্নিত করছেন আধিপত্য (hegemony) হিসেবে।' (সাঈদ, ২০১১ : ১৪৮)

২. 'নজরুল ইসলাম!
তসলিম ঐ নাম!
বাংলার বাদলায় ঘনঘোর ঝনঝায়,
দামামার দমদম লোহুময় গান গায়;
কাঁপাইয়া সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষ,
আলোড়িত আসমান ধরণীর বক্ষ;
সেই কালে মহাবীর তোমারে যে হেরিলাম,
নজরুল ইসলাম।' (জসীম, ২০০৬ : ২৩)

৩. 'জসীম উদ্‌দীন রচনা করেছেন ছন্দোবদ্ধ উপাখ্যান, বর্ণনা করেছেন জীবনকাহিনী, যে দায়িত্ব থেকে আধুনিকেরা মুক্ত করেছিলেন নিজেদের।... আধুনিক কবিতায় যেখানে ঘটেছে কবিদের ব্যক্তিতার জটিল, বহুস্তরিক আত্মপ্রকাশ, সেখানে জসীম উদ্‌দীন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করেছেন বর্ণনাবিবরণে। রোম্যানটিকদের, ও আধুনিকদের, কবিতায় ফিরে ফিরে পাওয়া যায় উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'আমি', এবং সবকিছুই হয়ে ওঠে তাঁদের ব্যক্তিতার বিস্তার; কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় 'আমি'র বদলে পাওয়া যায় বিভিন্ন তৃতীয়-পুরুষ-চরিত্র।' (হুমায়ুন, ২০১৩ : ৩৫৭)

গ্রন্থপঞ্জি

এম. এ. রহিম (নবম মুদ্রণ ২০১৭)। *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

জসীম উদ্‌দীন (ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৬)। *যাঁদের দেখেছি*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩ক)। *জসীম উদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ প্রথম খণ্ড*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৩খ)। *স্মৃতির পট*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৪)। *জসীম উদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ ২য় খণ্ড*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৫)। *স্মরণের সরণী বাহি*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(অষ্টম মুদ্রণ ২০১৭)। *জীবনকথা*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

(দশম মুদ্রণ ২০১৮)। *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

প্রবন্ধপঞ্জি

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (২০১১)। 'অরিয়েন্টালিজম' (অনু. আমীনুর রহমান)। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* [সম্পা. ফকরুল চৌধুরী], আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ. ১৪২-১৫১

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৩)। 'জসীম উদ্‌দীন : মাঠ-ঘাট ও জনপদ'। *মাটি ও মানুষের কবি জসীম উদ্‌দীন* [সম্পা. নাসির আলী মামুন], আদর্শ, ঢাকা। পৃ. ৩৪১-৩৫২

হুমায়ুন আজাদ (২০১৩)। 'জসীম উদ্‌দীনের কবিতা : রচনাকৌশল ও শাব্দ অবয়ব'। *মাটি ও মানুষের কবি জসীম উদ্‌দীন* [সম্পা. নাসির আলী মামুন], আদর্শ, ঢাকা। পৃ. ৩৫৬-৩৭৬